প্রাণের উৎস । ছবি : রাজেশ রক্ষিত

প্রাচীন ভারতে 'উপজাতি' ও 'উপজাতীয় সংস্কৃতি: একটি মূল্যায়নের প্রচেষ্টা

বিজয়া গোস্বামী

(লেখক, অধ্যাপক, প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, সংস্কৃত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

শুরুতেই বলি, 'উপজাতি' শব্দটি একটি অত্যাধুনিক পরিভাষা। এই নামটি দিয়ে সমাজের এমন একটি অংশকে বোঝায় যা নাকি আপাতদৃষ্টিতে তথাকথিত 'মূলস্রোতের' বাইরে। আমরা দেখি, আজকের দিনে কিছু মানুষকে উপজাতি আখ্যা দিয়ে একটি তালিকা বা তপশীলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বলাই বাহুল্য, প্রাচীন ভারতে এরকম আখ্যা ছিল না বা তাদের জন্য কোনো সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থাও কল্পিত হয়নি। এ যুগ বা প্রাচীন যুগের মধ্যে কোন রীতিটা ভালো আর কোনটা মন্দ, তার তুলনামূলক কোনো আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আর 'প্রাচীন' বলে একটি বিশেষ কোনো কালকে নির্দেশ করা যায় কি না এবিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাই এসব জটিলতার মধ্যে না গিয়ে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যেটুকু ধরা পড়েছে সেটুকু ধৈর্যশীল পাঠকের সঙ্গে 'শেয়ার' করছি মাত্র।

'প্রাচীন ভারত' বললে সেই বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে একটা দীর্ঘ সময়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সমস্তটায় কিন্তু এক রকম সামাজিক নিয়ম খাটে না—যেমন

আজকের থেকে ৫০ বছর আগের সামাজিক চিত্রের থেকে এখনকার চিত্রটা অনেকভাবে বদলে গেছে, আবার ৫০ বছর পরে আরো অনেকটা বদলে যাবে। এমনকি আজ থেকে ১০ বছর আগে যেরকম ছিল এখনো কি হুবহু সেরকম আছে? যে সময়কার কথা বলছি সেসময়ে বিশেষত বিদেশি আক্রমণকারী থেকে বিদেশি উপনিবেশবাদী, শিক্ষার্থী, ভবঘুরে, কতোই এসেছে এবং এখানেই থেকে গেছে—কবিগুরুর ভাষায় "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে"—সত্যিই তারা ফিরে যায়নি, নিজেদের কিছু না কিছু চিহ্ন রেখে গেছে। তার বেশির ভাগই কোনো না কোনো ভাবে মূলস্রোতে মিশে গেছে। অথর্ববেদ সংহিতায় ভূমিসূক্তেও যেমন বলা হয়েছে: জনং বিভ্রতি বহুধা বিবাচসং নানাধর্মাণং পৃথিবী যথৌকসাম্ (অ০বে০ ১২/১/৪৫)—পৃথিবী নানাভাষী, নানাধর্মা বহুজনের বাসস্থান—কিন্তু পার্থক্য রয়েই গেছে, বৈষম্য রয়েই গেছে।

বৈদিক যুগ : ভারতবর্ষে বৈদিক সাহিত্যকে সবচেয়ে প্রাচীন লিখিত নিদর্শন মনে করা হয়—হরপ্পা সভ্যতার যে লেখগুলি পাওয়া যায় সেই লিপির সমাধান এখনো হয়নি। এখনো পর্যন্ত মনে করা হয় বৈদিক সাহিত্যের লিপিবদ্ধ করার কাজ হয়েছিল ১৫০০-৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ কালে, এই সাহিত্যের উদ্ভব সম্ভবত আরো আগে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, এর মধ্যে ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ববেদের সংহিতাগুলি—যাকে মন্ত্রভাগ আখ্যা দেওয়া হয়—সেগুলি প্রাচীনতম, তার পরে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ইত্যাদি। এগুলিরও আভ্যন্তরীণ পৌর্বাপর্য আছে। অর্থাৎ ঋগ্বেদ সংহিতা প্রাচীনতম বলে মনে করা হয়, কিন্তু এর মন্ত্রগুলি নানা সময়ে উদ্ভূত এবং সংকলিত। আবার অথর্ববেদের কিছু মন্ত্র ঋগ্বেদের কিছু মন্ত্রের চেয়ে প্রাচীন—এইরকম গোলমেলে কিছু ব্যাপার আছে। এ বিষয়ে অনেক কথা বলা যায়, অনেক দ্বান্দ্বিক তথ্য উপস্থাপন করা যায়, কিন্তু সে সব বলতে গেলে এখনকার প্রাসঙ্গিক বিষয়টিতে আর পৌঁছনো যাবে না। তাই আপাতত বর্তমান বিষয়টি মাথায় রেখে বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্তটি মেনে নেওয়াই ভাল।

বৈদিক সাহিত্যে প্রধানত যে মনুষ্যগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে, তাদের নাম 'আর্য'। তার বাইরেও কিন্তু একটি বৃহত্তর গোষ্ঠী আছে, যারা আর্য নয়, অর্থাৎ যারা 'অন-আর্য'। অনার্য মানে খারাপ লোক, এমন নয়। অনার্য মানে আর্যেতর জাতি। বৈদিক সমাজ আর্যদের নিয়মে চলে, তাদের সমাজের বাইরে যে সমাজ আছে সেখানেও নিয়মকানুন আছে, সেগুলি তারা মেনে চলে। আর্যদের সমাজে একটি বর্ণাশ্রম ধর্মের কথা শোনা যায়, যেটি না কি দীর্ঘকাল ধরে সমাজের কাঠামোটাকে ধরে আছে। আশ্রমের কথা এখন থাক, বর্ণের কথাই বলি। এই যে সামাজিক 'বর্ণভেদ', এটি মূলত কাজের ভাগ অনুযায়ী, যাকে বলে division of labour। একশ্রেণির মানুষের কাজ অধ্যয়ন

অধ্যাপনা, যাদযজ্ঞ করে দেবতাদের কাছে মানুষের সুখদুঃখ জানানো, এরা হল ব্রাহ্মণ; কোনো শ্রেণির কাজ শিকার করে সবার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করা, হিংস্র প্রাণী বা আক্রমণকারী শত্রুদের কাছ থেকে সকলকে রক্ষা করা, আবার অন্যদের আক্রমণ করা, রাজ্য জয় করা, এরা হল ক্ষত্রিয়; কোনো শ্রেণীর কাজ আবার ব্যবসা বাণিজ্য করে সাধারণভাবে সম্পদ বৃদ্ধি করা, তারা হল বৈশ্য; এবং যে শ্রেণী কায়িক শ্রম করে সবার অন্নবস্ত্র জোগায় তারা হল শূদ্র। এই চারটি শ্রেণীর মানুষেরা সহজেই একটি শ্রেণী বা বর্ণ থেকে আর একটিতে যেতে পারত অনেক প্রাচীন কালে। পৌরাণিক উপাখ্যান অনুযায়ীই মনে করা যায়, ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছিলেন, ক্ষত্রিয় ত্রিশঙ্কু ব্রহ্মশাপে চণ্ডাল হয়েছিলেন ইত্যাদি। বৈদিক যুগে এই ব্যাপারটা সহজ ছিল। চতুর্বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদের অর্বাচীন অংশে একটি মন্ত্র পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছে, স্রষ্টার মুখ ব্রাহ্মণ, বাহুযুগল ক্ষত্রিয়, ঊরু বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্রের উৎপত্তি।

ব্রাহ্মণো'স্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো'জায়ত॥

ঋ০বে০ ১০/১০/১২

সম্ভবত এই মন্ত্রের অন্তর্ভুক্তির সময় থেকেই চতুর্বর্ণকে আলাদা আলাদা water-tight compartment এ বন্ধ করে রাখা শুরু হল।

যদি এই মত গ্রহণ করা হয়, যে আর্যজাতি অন্য কোনো দেশ (কোন দেশ তা নিয়ে বহু মতান্তর আছে) থেকে এসে ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহলে এটাও ধরে নিতে হবে, তাদের আসার আগে এমন কোনো এক সভ্যতা এ দেশে ছিল যার অধিকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাভূত করে আর্যেরা নিজ অধিকার কায়েম করে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, এই প্রাগ্ আর্য জাতিই হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো ইত্যাদি স্থানে নিজেদের সভ্যতার স্বাক্ষর রেখে গেছে। বৈদিক সাহিত্যে আমরা পড়ি, ইন্দ্র এক বিরাট পুরুষ, এক বিরাট দেবতা, কারণ তিনি এই 'দাস' বর্ণকে পরাজিত করে গুহায় ঠেলে দিয়েছেন (যো দাসং বর্ণম অধরং গুহাকঃ—ঋ০বে০ ২/১২/৩)। এই দাসদের 'দস্যু'ও বলা হয়েছে, তাই ইন্দ্র 'দস্যোর্হন্তা' (ঐ ঐ ১০)—দস্যুদের বধকারী। এই দাস ও দস্যুরা প্রথমেই মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন, গুহায় আবদ্ধ, পরাজিত জাতি।

এর সঙ্গে আর একটি জাতির প্রসঙ্গ আসে, যারা ইন্দ্রের আধিপত্য চ্যালেঞ্জ করেছিল। এরা হল 'পণি'। এই পণিদের কথা পাই ঋগ্বেদে সরমা-পণি সংবাদে (ঋ০বে০ ১০/১০৮)। এটি পড়ে মনে হয়, পণি নামক 'অসুরেরা' ইন্দ্রের গরু চুরি করেছিল। তাদের অনুসন্ধানে সরমা এসেছিল, 'রসা' নদী পার হয়ে। এই সরমা হল

'দেবশুনী' অর্থাৎ স্বর্গের কুকুর। পৃথিবীর যাবতীয় কুকুর সরমার সন্তান, তাই তাদের বলা হয় 'সারমেয়'। সরমা প্রাচীনতম যুগের প্রথম sniffer dog এবং সম্ভবত প্রাচীনতম মহিলা গোয়েন্দা। পণিরা কারা বলা কঠিন। ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন এরা আসলে Phoenician জাতি। এদের সভ্যতা যথেষ্ট উন্নত ছিল তা তাদের ভাষার প্রয়োগ থেকে স্পষ্ট। তাছাড়া তাদের তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্রও ছিল (অস্মাকমায়ুধা সন্তি তিগ্মা—ঐ ঐ ৫)।

পণিদের যে অসুর বলা হয়েছে, সেই 'অসুর' একটা জাতি। মূলত অসুর শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে 'অস্' ধাতু থেকে—যার মানে 'জ্বলজ্বল করা'। অসুরদের বহু উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে মেলে। অসুর আগে উজ্জ্বলকান্তি বা দেবতা বোঝাত। আবেস্তায় 'অহুর মজদা' নামে সর্বশক্তিমান দেবতার কথা পাওয়া যায়। এই অহুর এবং বেদের অসুর মূলত একই। একসময়ে দুটি গোষ্ঠীর বিবাদের ফলে ভাগ হয়ে যায়। এক গোষ্ঠীতে যে দেবতা, অন্যটিতে সে শত্রু। আবেস্তার শব্দসমষ্টির মধ্যে কিছু 'অহুর' অর্থাৎ 'ভালো' শব্দ আছে, আবার কিছু 'দএব' (সং০ দেব) অর্থাৎ মন্দ শব্দ আছে। আবার অসুর বেদে দেবতা থেকে শত্রু হওয়াতে 'অ-সুর' অর্থাৎ যে সুর নয়, এরকম ব্যাখ্যা বেরিয়ে আসে, ফলত 'সুর' মানে দেবতা এরকমই দাঁড়ায়। এরা কি Assyrian? সেক্ষেত্রে পণি এবং অসুর দুজনেই কি বহিরাগত? বিশেষত অথর্ববেদে আমরা 'ব্রাত্য'দের উল্লেখ পাই। অথর্ববেদের ১৫শ কাণ্ডে ব্রাত্যদের বিবরণ আছে। ব্রাত্যরা সম্ভবত একটি জাতিবিশেষ, যারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের নিয়মকানুন মানত না। এদের সমাজ কিছু নিজস্ব নিয়ম অনুসারে চলত। এরা ঠিক আর্য না আর্যেতর জাতিভুক্ত, তা বলা যায় না। এরা যাযাবর পশুপালক। কিন্তু গুহায় বন্দী দাস বা দস্যুদের তুলনায় এরা বেশি সম্মান পেয়েছে। এরা খুব সম্ভব অপরাজিত জাতি। পার্থিব ব্রাত্যদের মতো স্বর্গীয় ব্রাত্যও দেখা যায়, যথা মহাদেব, ঈশান বা রুদ্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রুদ্র বিবর্তনের গোড়ার দিকে অন্যতম আর্যেতর জাতির দেবতা রূপে প্রকাশ পান। পরে তিনি আর্যগোষ্ঠীর কাছে প্রভূত সম্মান পেয়েছিলেন। নিষাদ জাতি, যাদের জীবিকা ছিল শিকার, মাছ ধরা, নৌকা বাওয়া ইত্যাদি, তাদের নেতা বা 'নিষাদস্থপতি' (যথা রামায়ণের গুহ বা গুহক) রুদ্রযাগে অধিকারী ছিলেন। এটি কিন্তু বৈদিক যাগই। এই যাগে দক্ষিণা হল 'কূট' অর্থাৎ পাখিধরা ফাঁদ। তথাকথিত 'আর্য' ভাষায় এই সব আর্যেতর জাতির ভাষায় ব্যবহৃত অনেক শব্দ প্রচলিত হয়েছিল, বিশেষত পশুপাখি ফলফুলের নাম ইত্যাদি। অনেক শব্দ এই ভাবেই 'আর্য' ভাষায় এসেছে। মীমাংসাদর্শনের শাবরভাষ্যে (১/৩/১০) বলা হয়েছে, 'পিক' (কোকিল), 'নেম' (কাল), 'তামরস' (পদ্মফুল) ইত্যাদি শব্দের অর্থ আর্যেরা জানে না। এগুলি তাদের শিখতে হয় আর্যেতর জাতির কাছ থেকে। বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত উপজাতির

মধ্যে কিরাত, পুলিন্দ, ইত্যাদি সব জাতিই আছে, যাদের 'ম্লেচ্ছ'ও বলা হয় (ভেদাঃ কিরাতশবরপুলিন্দাঃ ম্লেচ্ছজাতয়ঃ—অমরকোশ, ১৯৯৬)। 'ম্লেচ্ছ' শব্দটি সম্ভবত 'ম্লিষ্ট' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ 'অস্ফুটবাক'। যারা আর্যদের ভাষা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে পারত না তারাই ম্লেচ্ছ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এরা চতুর্বর্ণের মধ্যে কোনটিতে পড়ে? অনুমান হয়, প্রাচীন বৈদিক যুগে এই চাতুর্বর্ণ্যের ধারণা হয় উদ্ভূত হয়নি, অথবা খুব বীজাকারে ছিল। এক বর্ণ থেকে বর্ণান্তরে যাওয়া সহজ ছিল এবং তথাকথিত উপজাতিদেরও বিদ্যাশিক্ষায় কোনো বাধা ছিল না। এমনকী পরমার্থতত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করতেও সকলেই অধিকারী ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়ন হত বলে এরা শিক্ষালাভে অধিকারী, এবং শূদ্রেরা কায়িক শ্রম করত বলে শিক্ষালাভে অনধিকারী, এই নিয়মটা সম্ভবত অতটা কঠোর ছিল না। উপনিষদেই আমরা এই অধিকারের বিবরণ পাই। সযুগ্বা অর্থাৎ 'গাড়িওয়ালা' রৈক্কের গল্প (ছা ০উ০ ৪/১-৩) এর অন্যতম প্রমাণ। দরিদ্র রৈক্ক তার ঠেলাগাড়ির নীচে বসে তার কুষ্ঠের ক্ষত চুলকাচ্ছে, এমন সময়ে ধনকুবের জানশ্রুতি তার কাছে উপস্থিত হয় পরমার্থতত্ত্ব লাভের আশায়। রৈক্ক তাকে 'শূদ্র' বলে ব্যঙ্গ করে—অর্থাৎ শূদ্র বলতে এমন লোককেই বোঝানো হচ্ছে যার ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি। রৈক্ককে 'ব্রাহ্মণ' বলা হয়েছে তার ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য। অথচ যে ব্যক্তি গাড়ি ঠেলে জীবিকা অর্জন করে সে তো জাতিতে শূদ্র হবারই কথা। জাবাল সত্যকামের কাহিনী তো কবিগুরু অমর করে রেখে গেছেন (ঐ ৪/৪)। সত্যকামের পিতৃপরিচয় ছিল না, কিন্তু সে ঋষি গৌতমের কাছে পরিচয় দিয়েছিল তার মাতা জবালার—এবং জবালার ভাষ্যেই নিজের জন্মবৃত্তান্ত দিয়েছিল—কবির ভাষাতেই বলি—

যৌবনে দারিদ্রদুখে
বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে;
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে;
গোত্র তব নাহি জানি তাত!

'ব্রাহ্মণ', চিত্রা

মূলেও প্রায় এরকমই আছে. সেই সত্যকামকে যে গুরু শুধু বিদ্যালাভের অধিকার দিয়েছিলেন তাই নয়, ঋষি সত্যকাম তাঁর 'ভর্তৃহীনা' মায়ের পরিচয়ে সগৌরবে নিজেকে ঘোষিত করেছেন—তিনি 'জাবাল' সত্যকাম—তিনি জবালার পুত্র।

অনেক বলার থাকলে কোথায় থামতে হবে বোঝা সমস্যা হয়। আমার মতো অজ্ঞ ব্যক্তিরও এ যুগ সম্বন্ধে এতই বলার থাকে যে শেষ হতে চায় না। নেহাৎ পাঠকবর্গের ধৈর্যের পরীক্ষা নেব না বলেই বৈদিক যুগের কথা এখানেই শেষ করছি।

মহাকাব্যের যুগ : 'মহাকাব্য' বলতে অনেক কাব্যকেই বোঝাতে পারে, কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মহাকাব্য নামটি মূলত মহাভারত ও রামায়ণকে চিহ্নিত করে। এই দুটিকে বলা হয় 'real epic' এবং কালিদাস প্রমুখ কবিদের রচিত কাব্যগুলি 'artificial epic'। তার প্রধান কারণ, এই দুটি গ্রন্থ ক্রমশ যুগে যুগে, বহু মানুষের, বহু জাতির, বহু চিন্তাধারার সংযোগে স্তরে স্তরে সংকলিত হয়ে উঠেছে। যেমন বৈদিক যুগ বহু শতাব্দী ধরে বিস্তৃত, তেমনি মহাকাব্যগুলিও একাধিক শতাব্দীর নানা চিন্তার ফসল। যদি বৈদিক যুগের বিস্তৃতি মোটামুটি ৫০০ খ্রিঃ পূঃ বলে ধরা যায়, তবে তার শেষের দিকে মহাকাব্যের যুগ শুরু হয়ে গেছে বলে মনে করতে হবে। মহাভারতের সংকলনের কাল ৪০০ খ্রিঃ পূঃ থেকে ৪০০ খ্রীঃ বলে ধরা হয়—তার পরেও যে এর সংযোজন হয়নি এমন নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। রামায়ণের সংকলনের কাল ৫০০ খ্রীঃ পূঃ থেকে ৩০০ খ্রীঃ, এবং এর সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। এর মধ্যে সেই চিরাচরিত কালাতীত ঘটনাপ্রবাহ লিপিবদ্ধ হয়েছে—যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলির নিয়তি। মহাভারতের দীর্ঘকালব্যাপী প্রসারের মধ্যে তিনটি সংযোজন ঘটেছিল—প্রথম পর্বে এর নাম ছিল 'জয়' এবং সেই স্তরে বিষয়বস্তু ছিল কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। দ্বিতীয় স্তরে এর নাম হল 'ভারত', যুক্ত হল ভরতবংশের ইতিহাস। তৃতীয় স্তরে নাম হল 'মহা-ভারত', সংযোজন ঘটল ব্রাহ্মণ-কেন্দ্রিক বা ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের অনুশাসন, এবং এর নাম দেওয়া হয় 'ভার্গব'সংযোজন। ভার্গব হলেন পরশুরাম যিনি বারে বারে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করে ব্রাহ্মণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মহাভারতের স্রষ্টারূপে ব্যাসদেবের নাম পাওয়া যায়। এটি লিপিবদ্ধ করেছেন গণেশ। ব্যাসের কাছ থেকে শুনে তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন এটি আবৃত্তি করেছিলেন জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে। তাঁর কাছ থেকে শুনে আবার সৌতি উগ্রশ্রবা এই মহাভারত আবৃত্তি করেছেন শৌনকের যজ্ঞে। ফলত এইভাবেই অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের উদ্ভব। রামায়ণ সে তুলনায় অনেক ছোট—মাত্র সাত কাণ্ডে সমাপ্ত। এখানে প্রবক্তা প্রধানত দুজন—রাম ও সীতার যমজ পুত্র লব ও কুশ। এই সাত কাণ্ডের মধ্যে প্রথম (আদি বা বাল) কাণ্ডের বৃহৎ অংশ এবং উত্তরকাণ্ডের প্রায় সমগ্রটুকুই পরবর্তীকালের সংযোজন। এছাড়া অন্যান্য কাণ্ডেও প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। এই দুটি গ্রন্থ বলা যেতে পারে এক দীর্ঘ সময়ের সামাজিক দলিল।

পূর্বে যে সব ম্লেচ্ছ জাতির কথা বলা হয়েছে, তাদের আমরা মহাভারতেও পাই। এর মধ্যে অন্যতম কিরাত জাতি। এদের সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায়, এরা হিমালয়বাসী, মনে হয় পার্বত্য উপজাতি। হিমালয়ে তপস্যা করার সময়ে অর্জুনের কাছে মহাদেব কিরাতের ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। টীকাকারেরা 'কিরাত' শব্দের ব্যাখ্যা করেন—কিরন্ অটতি ইতি—অর্থাৎ যারা সীমান্তে ভ্রমণ করে। পার্বত্য জাতির মতো

এদের গায়ের রং খুব ফরসা, একটু হলুদ আভা—সোনার মতো। মহাদেব কিরাতবেশ ধারণ করলে তাঁকে সোনার গাছ বা সুমেরু পর্বতের মতো দেখাচ্ছিল।

কৈরাতং বেশমাস্থায় কাঞ্চনদ্রুমসন্নিভম্।
বিভ্রাজমানো বিপুলো গিরির্মেরুরিবাপরঃ॥
(মহাভারত, বনপর্ব, ১৩৯/২)

অর্থাৎ অত্যন্ত বলশালী। মহাদেবের সঙ্গে দেবী ভবানীও কিরাতবেশী ছিলেন, এবং অন্যান্য কিরাত রমণীরাও ছিল। স্বয়ং মহাদেবকে কিরাত ছদ্মবেশে ধারণ করিয়ে যেন এই জাতিকে একটু বিশেষ সম্মান দেওয়া হল। অনুমান হয়, এই পার্বত্য ও সীমান্ত জাতি অনেকটা স্বাধীন ছিল। পূর্বে সভাপর্বেও বলা হয়েছে রাজসূয় যজ্ঞের আগে অর্জুন সব পর্বত জয় করেছিলেন (ঐ, সভাপর্ব, ২৭)। এই জয় ঠিক রাজ্য সংযোজন করা নয় বা রাজ্যের পরিধি বাড়ানো নয়, বিভিন্ন রাজ্যের অধিপতিদের বশ্যতা স্বীকার করামো মাত্র। এই জয় কিরাত রাজাদের উপরেও হয়েছিল (ঐ ঐ ২৬/৩)। এই কিরাতেরা নানা মণিমাণিক্যের অধিকারীও ছিল (ঐ ঐ ৩০)।

কিরাতদের যে সম্মান দেওয়া হয়েছিল, তা সবার প্রাপ্য হয়নি। নিষাদদের কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রধানত শিকার, মাছ ধরা, নৌকা বাওয়া—এ সবই এদের জীবিকা। এরা অরণ্যবাসী কিন্তু যদিও এরা তথাকথিত আর্য সমাজের বাইরে, এদের স্থান কতকটা নীচেই। তবে বৃত্তিগত স্বাধীনতার কারণে অন্যান্য বর্ণের মানুষদের নিষাদদের উপর অনেকটা নির্ভর করতে হত। "এদের বৃত্তিগত স্বাধীনতার জোরে এরা এক সময়ে ব্রাহ্মণ্য সমাজের এক কোণে ঠাঁই পায়। পাণিনি ব্যাকরণে পড়ি, 'নিষাদপঞ্চমাঃ পঞ্চ জনাঃ', অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদকে ধরে সমাজের পাঁচজন; এই পাঁচজনই তখন সমাজের প্রতিনিধি। এখন আমরা যে পঞ্চায়েৎ (পঞ্চায়েত থেকে) বলি তার 'পঞ্চ' এরাই, এর থেকেই গ্রামের পাঁচজনের কথাই সমাজের বিধান।" (প্রাচীন ভারত, সুকুমারী ভট্টাচার্য, পৃ. ৪৫, প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম খণ্ড)

যারা শিকারি, তাদের ধনুর্বিদ্যায় পটু হওয়াই স্বাভাবিক এবং অবধারিত। এতৎসত্ত্বেও নিষাদদের স্থান ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের নীচে—তাদের সঙ্গে সমান কক্ষ্যায় নয়। নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্যের নাম এই প্রসঙ্গে না এসে পারে না। শুধুমাত্র নিষদা হবার 'অপরাধে' ব্রাহ্মণ অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের শিষ্যত্ব পায়নি এই যুবক। পরে যখন সে নিজের চেষ্টায় অস্ত্রবিদ্যায় এতটাই পটু যে অর্জুন স্বয়ং তার কাছে হার মানার অবস্থায়, তখন যে দ্রোণাচার্য তাকে 'নৈষাদিরিতি' অর্থাৎ নিষাদপুত্র বলে শিষ্য করেননি, তিনিই 'গুরুদক্ষিণা' হিসেবে তার ডানহাতের বুড়ো আঙুল দাবি করলেন এবং সে-ও তাই দিল। ফলে সে আর আগের মতো ক্ষিপ্র রইল না (আদিপর্ব, ১৩০)। অর্থাৎ নিজের জীবিকাটুকু সে কোনোমতে অর্জন করতে পারবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের সমান

কোনোদিন হবার স্পর্ধা দেখাতে পারবে না। নিষাদ যতক্ষণ অধীনে আছে ততক্ষণ তার উপযোগিতা। সে যদি ক্ষত্রিয় রাজা বা রাজকুমারের সঙ্গে সমান বলশালী হয়ে ওঠে তবে সে যে রাজত্বের দাবি রাখবে না কোনোদিন—এর কি কোনো স্থিরতা আছে? তখন এক মস্ত সমস্যা সৃষ্টি হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, স্বাভাবিক অবস্থায় এদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগে এবং যুদ্ধেও এরাই প্রধান রশদ (cannon fodder)!

রামায়ণের আদিকাণ্ডে রামায়ণের সূচনাপর্বে এক নিষাদের কথা জানা যায় যে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে মিলনরত অবস্থায় হত্যা করে বাল্মীকির কবিসত্তাকে প্রথম উন্মোচিত করে। মৃত সহচরকে দেখে তার সঙ্গিনীর শোকবিহ্বলতায় বাল্মীকির মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল বৈদিক মন্ত্রের পরবর্তী প্রথম ছন্দোময়ী বাণী—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ২/১৫

—হে নিষাদ! তুমি কোনোদিন প্রতিষ্ঠা পাবে না, যেহেতু তুমি কামমোহিত ক্রৌঞ্চযুগলের একটিকে বধ করেছ।

এই প্রথম ছন্দোময়ী উক্তিটি যেহেতু শোক থেকে উদ্ভূত, তাই এর নাম হল 'শ্লোক'। কিন্তু এখানে নিষাদের নিষ্ঠুর নির্মম মূর্তিই আমরা দেখি। এখানে মনে রাখতে হবে, সমগ্র বাল্মীকীর কাহিনীটিই পরবর্তীকালে সংযোজন। তাই এই উপাখ্যানে নিষাদের যে চিত্রটি দেখছি তা কালক্রমে নিষাদের archetype হিসেবে গড়ে উঠেছে। তথাকথিত 'মূল' রামায়ণে নিষাদের প্রথম যে চিত্র পাই সেটি হল নিষাদপতি গুহের। ইনি রামের 'আত্মসম' সখা। গুহ রামকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, তাঁকে নিজগৃহে আতিথ্য নিতে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর গৃহে সবরকম আহার্য, পানীয়, শয্যা, ঘোড়াগুলির খাদ্য—সব কিছুই গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কিন্তু রাম সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর যুক্তি: তিনি বনবাসী তাপস, শুধু ফলমূল আহার করে থাকবেন। কেবলমাত্র ঘোড়াদের খাবার ছাড়া কিছুই নিতে তিনি অস্বীকৃতি জানান। এইভাবে মোলায়েম করে গুহের স্নেহের দান রাম প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁর জন্য জলও লক্ষ্মণ নিজে তুলে আনলেন (ঐ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৫০/৩৩-৪৮)। এই এক পথ দিয়েই ভরত এসেছিলেন সসৈন্যে, রামকে ফিরিয়ে আনতে। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা কোথায় ছিলেন, কি খেয়েছিলেন সব পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষরূপে জিজ্ঞাসা করে গুহকে জানালেন, তিনিও রামের মতোই মাটিতে শোবেন, ফলমূল খাবেন। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল! যাই হোক, এসব থাকলেও গুহ রামের 'সখা' হয়েছেন। তিনি নিষাদস্থপতি, যাঁদের রুদ্রযাগের অধিকার ছিল। এই নিষাদদের জীবিকা এখানে শিকার, মাছধরা, নৌকা বাওয়া। এরাই রাম, ভরত এঁদের নৌকা করে গঙ্গা পার করিয়েছেন।

মনুসংহিতায় দেখি, তথাকথিত উপজাতির মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে গেছে। বিদেশি ও দেশি উপজাতি একই পর্যায়ে পড়ছে। পিতা ব্রাহ্মণ ও মাতা শূদ্র হলে সন্তান নিষাদ। ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতা হলে সন্তান আভীর (গোয়ালা)। নিষাদ পিতা ও শূদ্রা মাতার সন্তান পুক্কস। ক্ষত্রিয় পিতা ও শূদ্রা মাতার সন্তান বা শূদ্র পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতার সন্তান শ্বপাক (চণ্ডাল)। নিষাদ পিতা এবং শূদ্র বা বৈশ্য মাতার সন্তান দাশ বা কৈবর্ত (জেলে) (মনু০১০ম)। মনুই বলেছেন, ঝল্ল, মল্ল, খশ, দ্রবিড় ইত্যাদি হল ব্রাত্য রাজন্য (ক্ষত্রিয়)। এরা না কি আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়ের সন্তান। এরা বৃষল বা শূদ্র। এর মধ্যে কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ—সবাই পড়ে (ঐ ঐ)। এর বাইরের আর্যভাষী বা ম্লেচ্ছভাষী মানুষেরা দস্যু। মোটামুটি সবারই এদের স্থান শূদ্র গোষ্ঠীতে।

চণ্ডাল বা শ্বপাকদের বিষয়েও ফাঁকে ফাঁকে বলা হয়েছে। 'শ্বপাক' অর্থাৎ যারা কুকুরের মাংস রেঁধে খায়। 'চণ্ডাল শব্দটি 'চণ্ড' অর্থাৎ তীক্ষ্ণস্বভাবের বা প্রবল—এখান থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। ডোম, চণ্ডাল, এদের কাজ ছিল মড়া পোড়ানো, অপরাধীকে শূলে চড়ানো, প্রয়োজনে রাজার অহিতকামী ব্যক্তিকে হত্যা করা—এই সব। এই ভয়ানক বা 'চণ্ড' কাজ করার জন্যই 'চণ্ডাল'।

উপজাতি বা আদিবাসী আর্যেতর জাতির কথা বলতে গেলে রাক্ষস ও বানরদেরও প্রসঙ্গ তুলতে হয়। এদের সম্বন্ধে অবশ্য রামায়ণেই বেশি বলা হয়েছে। কিন্তু মহাভারতেও রাক্ষস, অসুর, দানব, এদের পাওয়া যায়। বেদে যে অসুরদের কথা বলা হয়েছে, মহাভারতের অসুর তারাই কি না সেটা বিচার্য। মহাভারতে আছে, অদিতির পুত্রেরা আদিত্য, দিতির পুত্রেরা দৈত্য। দনুর পুত্রেরা দানব। তারা অত্যন্ত বলশালী ও উদ্ধত। অদিতি, দিতি, দনু এঁরা সকলেই দক্ষ প্রজাপতির কন্যা এবং কশ্যপের পত্নী। আদিত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দৈত্যরা পৃথিবীতে মানুষ ও পশুর গর্ভে জন্ম নিল। তারাই হল অসুর। এরা কিন্তু শূদ্র নয়। খুব সম্ভব এরা ভিনদেশী আক্রমণকারী, অনেকে মনে করেন এরাই Assyrian (আদিপর্ব ৬৪)। এছাড়া আদিপর্বেই (৬৭/২৫) বাহ্লীক নামে রাজার উল্লেখ পাই। ইনিও কি বিদেশী (Balkh)?

মহাভারতে প্রথম যে রাক্ষসগোষ্ঠীর বিস্তারিত বর্ণনা পাই, তারা হল দুই ভাইবোন—হিড়িম্ব ও হিড়িম্বা। হিড়িম্ব ভয়ানক দেখতে ছিল, বর্ষার মেঘের মতো তার গায়ের রং, কটা চোখ, ভয়ঙ্কর দাঁত (৮টি তীক্ষ্ণ দাঁত ছিল), লাল চুল দাড়ি, গাধার মতো কান, পশ্চাদ্দেশ ঝুলে পড়েছে (ঐ ১৫১)। এরা অত্যন্ত বলশালী। হিড়িম্বা ভীমকে দেখে তাঁর প্রেমে পড়ে যান এবং তিনি যেহেতু 'কামরূপিণী' (ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করার ক্ষমতা আছে যার), তিনি অপূর্ব সুন্দরী হয়ে ভীমের কাছে আসেন। হিড়িম্বের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধে প্রধান অস্ত্র ছিল গাছপালা, এবং নিজেদের বাহুবল। মনে

হয়, এই রাক্ষসদের খুব উন্নত প্রযুক্তি আয়ত্ত ছিল না। হিড়িম্ববধের পর কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন। এই ধরনের বিবাহ সুতরাং সমাজে স্বীকৃত ছিল। এই বিবাহের ফলে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। তার চেহারার বর্ণনা অনেকটা হিড়িম্বের মতোই। এ দিয়ে রাক্ষসদের কেমন দেখতে ছিল তার সঠিক পরিচয় মেলে না। ঘটোৎকচ যুদ্ধে পটু ছিল এবং নানা ইন্দ্রজাল জানত। রাক্ষসদের এই ম্যাজিকে নৈপুণ্যের কথা আমরা বারে বারেই পেয়েছি। রামায়ণে মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে রামকে প্রবঞ্চিত করতে, রাবণ মায়াবলে তপস্বীবেশ ধারণ করে সীতাকে হরণ করতে আসেন, ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করেন, মায়াসীতার মূর্তি দিয়ে রামকে ছলনা করার চেষ্টা করা হয়—এরকম বহু উদাহরণ পাওয়া যায়।

রাক্ষসদের কেমন দেখতে ছিল সে বিষয়ে নানা বর্ণনা আছে। হিড়িম্ব ও ঘটোৎকচের কথা তো বলেইছি। শূর্পনখা বোধ হয় হিড়িম্বার মতো কামরূপিণী ছিল না, তাই সে রামের কাছে যখন এসেছিল তখন সে 'দুর্মুখী', 'মহোদরী', 'বিরূপাক্ষী', তার মাথার চুল লাল (অরণ্যকাণ্ড, ১৭/৯-১০)। কবন্ধ নামে যে রাক্ষস রাম-লক্ষ্মণকে আক্রমণ করেছিল, তাকে দেখতে খুব বিকট ছিল, কিন্তু সে জানায়, পূর্বে সে অত্যন্ত সুপুরুষ ছিল, ত্রিলোকে তার রূপের খ্যাতি ছিল—সূর্য, চন্দ্র বা ইন্দ্রের মতো তার কান্তি ছিল। ভয়ঙ্কর চেহারা করে লোককে ভয় দেখানোর জন্য ঋষির শাপে তার এই বিকট মূর্তি। সুন্দরকাণ্ডে রাবণের বর্ণনা পাওয়া যায়। লঙ্কায় তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে হনুমানের মনে তাঁর সম্বন্ধে 'সুরূপ', 'কামরূপী' এই সব বিশেষণ উদয় হয়। তাঁর গাত্রবর্ণ মেঘের মতো, চোখ রক্তবর্ণ (সুন্দরকাণ্ড, ১০/৭-১১)। তাঁর মহিষী মন্দোদরী এবং অন্যান্য অন্তঃপুরিকাও অসামান্য সুন্দরী। এমনকী মন্দোদরীকে দেখে হনুমান প্রথমটা সীতা বলে ভুল করেছিলেন (ঐ ১১/৫২-৫৩)। কাজেই রাক্ষস মাত্রেই বিকট দেখতে এরকম বলা যায় না। রাবণকে সভায় দেখে হনুমানের মনে হয়েছিল: "কি রূপ! কি ধীরতা! কি মহত্ত্ব! কী দীপ্তি! রাক্ষসরাজের মধ্যে সর্ব সুলক্ষণের কি প্রভাব!

অহো রূপমহো ধৈর্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ,
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্বলক্ষণযুক্ততা॥

ঐ ৪৯/১৭

রাক্ষসদের সভ্যতা যথেষ্ট উন্নত ছিল বলেই মনে হয়। বিশেষত লঙ্কানগরীর বর্ণনা থেকে তাই অনুমান করা যায়। লঙ্কাকে দূর থেকে দেখেই হনুমানের মনে হয়েছিল যেন অমরাবতী (ঐ ঐ ১/২১৩)। যদিও বলা হয়েছে এটি বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে এটি রাক্ষসদেরই বাসস্থান। লঙ্কা পাহাড়ের উপরে নির্মিত একটি বর্ধিষ্ণু নগরী, এমন ভাবেই তৈরি যে মনে হয় নগরীটি আকাশে লাফিয়ে উঠেছে (প্লবমানমিবাকাশে—ঐ ঐ ২/২০)। এই নগরীর চারিদিকে পরিখা বা গড়খাই।

তার মধ্যে পদ্মফুল ফুটে আছে। এর নান্দনিক দিকটিও লক্ষণীয়। সোনার প্রাকারে ঘেরা এই নগরী, শরৎকালের সাদা মেঘের মতো বিশাল বিশাল সাদা সাদা অট্টালিকায় পূর্ণ। মুখ্য তোরণটিও সোনার, তাতে লতাপাতা খোদাই করা (ঐ ঐ ঐ ১৪-২০)। নগরী রক্ষার জন্য চারিদিকে সমুদ্র তো আছেই, উপরন্তু হিংস্র রাক্ষস ও নাগেরা সর্বক্ষণ পাহারা দিচ্ছে। তাদের হাতে ভয়ানক সব অস্ত্রশস্ত্র। লঙ্কায় আছে পুষ্পক বিমান, যা রাবণ কুবেরের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। এই বিমান আরোহীর ইচ্ছামতো চলত, সারথির দরকার হত না—remote control বিমান আর কি! রাক্ষসদের অস্ত্রশস্ত্রও আধুনিক বহু অস্ত্রের মতো। তার মানে এই নয় যে আমরা দাবি করছি যে এই সব অস্ত্রশস্ত্র বা বিমান রাক্ষসেরা তৈরি করতে পারত। তবে এসব কল্পনা করতে গেলেও তো কল্পনার অনেকটা অগ্রগতি স্বীকার করতেই হয়।

বানরদের সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে রামায়ণের 'বানরেরা' ল্যাজ ওয়ালা গাছে চড়া বাঁদর নয়। এরা একটি অরণ্যবাসী উপজাতি। অনেকে বলেন, 'বানর' নামটি মূলত 'বান নর' (অর্থাৎ বনবাসী মানুষ) থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এই শব্দে haplology বা সমাক্ষরলোপের ফলে একটি 'ন' লোপ পেয়েছে। এই বানরেরা কিষ্কিন্ধ্যা এবং তার আশেপাশের এলাকার বাসিন্দা। হয় তো বানর নামক প্রাণীটি এই জাতির totem। এরা যুদ্ধে গাছ-পাথর এবং শারীরিক বল ব্যবহার করে। (বালী তো সেযুগে নামজাদা মল্লযোদ্ধা ছিলেন), কিন্তু তাই বলে এদের উন্নত প্রযুক্তি নেই এমন বলা যায় না। আগুনের ব্যবহার জানলেই আমরা বলি, উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী, সে ব্যাপারে তো বানরদের কোনো খামতি নেই। রাম ও সুগ্রীবের সখ্য তো অগ্নিসাক্ষী করেই হয়েছিল (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৫)। রামের বানর বাহিনীর মধ্যে অন্যতম প্রধান নল বিশ্বকর্মার পুত্র এবং উন্নত প্রযুক্তিবিদ। তাঁর নৈপুণ্যের প্রধান নিদর্শন সাগরের উপরে সেতু, যার উপাদান শুধু পাথর আর গাছ! বানরদের উৎপত্তিও দেবতাদের থেকে। রাবণবধের জন্য দেবতারা প্রধান অপ্সরা, গন্ধর্বী এবং যক্ষ, নাগ, ভালুক ও বানরের কন্যাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন. ব্রহ্মার পুত্র জাম্বুবান (ভালুক), ইন্দ্রের পুত্র বালী, সূর্যের পুত্র সুগ্রীব, বিশ্বকর্মার পুত্র নল, অগ্নির পুত্র নীল, এইভাবে তাদের জন্ম হয়, এবং হনুমান যে 'মারুতি' অর্থাৎ পবনের পুত্র সে তো সবাই জানে। অনেক প্রাচীন জাতিরই জন্ম দেবতা থেকে, বা দেবতার প্রতিনিধি পশুর থেকে, এরকম কিংবদন্তী সারা পৃথিবীর অনেক জাতি সম্বন্ধেই প্রচলিত আছে।

বানরদের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা যায় না। নলের প্রযুক্তিতে নৈপুণ্যের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। জাম্বুবান রামের মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রিত্ব করতে গেলে যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধি লাগে—অবশ্য আজকের দিনে সে কথা কাউকে বিশ্বাস করানো কঠিন! আর হনুমান তো সর্ববিদ্যাবিশারদ! সুগ্রীবের আদেশে যখন তিনি প্রথম

রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে পরিচয় করতে যান, তখন তাঁর পরনে ভিক্ষুবেশ ছিল। তিনি দুই অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যথেষ্ট সম্ভ্রম উৎপাদনের যোগ্য কথাবার্তা বলেছিলেন। তাঁর মার্জিত ও মনোজ্ঞ (বাচা শ্লক্ষ্ণয়া সুমনোজ্ঞয়া—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৩/৩) মুগ্ধ হয়ে রাম লক্ষ্মণকে বলেছিলেন: "এই ব্যক্তি বানররাজ মহাত্মা সুগ্রীবের সচিব, তাঁরই আদেশে আমাদের কাছে এসেছেন।... যে ব্যক্তির ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদের জ্ঞান নেই তিনি এমনভাবে কথা বলতে পারেন না। অবশ্যই ইনি সমগ্র ব্যাকরণ অধ্যায়ন করেছেন, কারণ ইনি এতগুলি কথা বললেন, একটিও অশুদ্ধ প্রয়োগ করলেন না। এঁর মুখ, চোখ, কপাল ও ভ্রূতে এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোনো মুদ্রাদোষ দেখা যায়নি। ইনি সংক্ষেপে অসন্দিগ্ধভাবে, অবিলম্বিত গতিতে এবং অনায়াসে হৃদয়স্থ মধ্যমা বাক্‌কে কণ্ঠস্থ বৈখরী বাক্ এর দ্বারা মধ্যমস্বরে প্রকাশ করেছেন। অবশ্যই এভাবে কথা বলার জন্য এঁর সংস্কার আছে।" (ঐ ঐ ২৬-৩৩)। তাছাড়া দূতের কাজ যে সে করতে পারে না। দৌত্যকর্ম শিখতে হয়, ধর্মসাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রে তার নির্দেশও আছে। হনুমানের কথায় রামের—যিনি কি না রাজার ছেলে, অতএব বহু diplomat দেখেছেন—তাঁর ধারণা হয়েছে, এই ব্যক্তি দৌত্যকর্মেও যথেষ্ট অভিজ্ঞ। সুতরাং বানর জাতি শুধুমাত্র সভ্যজাতি নয়, অতি শিক্ষিত ও মার্জিত জাতি রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

এই যে 'উপজাতি' দুটির কথা বলা হল, এরা চতুর্বর্ণের কোন শ্রেণীতে পড়ে? আমরা দেখেছি, এক সময়ে নিষাদেরা এই চতুর্বর্ণের বাইরে 'পঞ্চম'। কিন্তু তারও পরে নিষাদ, কিরাত সবাই শূদ্র। রাক্ষস ও বানরদের উদ্ভব দেবতা বা ঋষিদের থেকে। রাক্ষসেরা ঋষি কশ্যপের সন্তান। বানরেরা তো ইন্দ্র, সূর্য, পবন প্রমুখ দেবগণের অসবর্ণ জাত সন্তান। তবে এরা শূদ্র হতে পারে না। উপরন্তু এদের সকলের বেদপাঠের অধিকার ছিল। শূদ্র ভিন্ন অন্য তিনটি বর্ণের উপনয়ন হত এবং উপনয়ন না হলে বেদপাঠের অধিকার জন্মাত না। রাবণ সম্বন্ধে শোনা যায় তিনি ব্রাহ্মণ। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় অনেক যাগযজ্ঞ করেছেন। তাঁর পুত্র ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ শেষ করতে পারেননি—তার পূর্বেই তিনি নিহত হন। এঁরা কেউ ম্লিষ্টভাষী নন! বানরদের শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা তো বলা হয়েছে—রামের বিচারে তিনি সব বেদগুলি পাঠ করেছেন। এখানে এটাও বিচার্য—এই সব সামাজিক নিয়ম কবে থেকে কঠোর ভাবে প্রযোজ্য হল। বৈদিক যুগে আমরা রৈক্বকে ব্রহ্মজ্ঞানীদের শ্রেষ্ঠ বলে জেনেছি। সেই সর্বজনীন সুযোগ করে থেকে সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে গেল? মহাকাব্যেরও প্রাচীন অংশে এক শ্রেণী থেকে অপর শ্রেণীতে যাবার অধিকার ছিল। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হয়েও তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছিলেন। কিন্তু অন্তিম সংযোজনে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যে ইক্ষ্বাকু বংশে রামের জন্ম, সেই বংশেরই এক পুরুষ—রাজা ত্রিশঙ্কু—সশরীরে স্বর্গে যাবার জন্য যজ্ঞ করতে চাইলে তাঁর

কুলগুরু ঋষি বশিষ্ঠ তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। এর পরে তিনি বশিষ্ঠের পুত্রদের কাছে একই আবেদন নিয়ে গেলে তাঁদের অভিশাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁর গায়ের রং নীল হয়ে গেল, মাথায় কদমছাঁট চুল, পরনে নীল কাপড়, গায়ে চিতাভস্ম মাখা, হাতে পায়ে লোহার গহনা। এই অবস্থায় তিনি বিশ্বামিত্রের কাছে গেলেন এবং বিশ্বামিত্র তাঁর যজ্ঞে পুরোহিত হতে সাদরে সম্মত হলেন। সব মুনিঋষিরা সেই যজ্ঞে আমন্ত্রিত হলেন এবং প্রায় সকলেই এলেন। কেবল মহোদয় নামে এক ঋষি এবং বশিষ্ঠের একশো জন পুত্র বলে পাঠালেন, যে যজ্ঞে চণ্ডাল যজমান এবং ক্ষত্রিয় পুরোহিত, সেরকম যজ্ঞে কোনো দেবেষি বা ব্রাহ্মণ হবিষ্য ভোজন করতে পারেন না। চণ্ডালের অন্নে প্রতিপালিত হয়ে বিশ্বামিত্রের দ্বারা পালিত হয়ে ত্রিশঙ্কু কেমন করে স্বর্গে যাবেন? তাঁদের আপত্তি সত্ত্বেও অন্য সব মুনিঋষিরা এলেন এবং যজ্ঞ হল, ত্রিশঙ্কু ধীরে ধীরে স্বর্গে উঠতে লাগলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইন্দ্র তাঁকে বাধা দিলেন। তবে তিনিও বিশ্বামিত্রের প্রভাব এড়াতে পারলেন না। ত্রিশঙ্কু স্বর্গ পর্যন্ত উঠতে পারলেন না বটে, কিন্তু মাঝপথে একটি নতুন নক্ষত্ররাশি (constellation) সৃষ্টি করে ইন্দ্র সেখানে তাঁকে স্থান দিলেন। সেখানেই তিনি এখনো অবস্থান করে আছেন—ঊর্ধ্বপাদ অধঃশির হয়ে (রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৫৮)। এই যে গল্পটি, এটি যেন ১৮শ-১৯শ শতাব্দীর 'একঘরে' হবার একটি গল্প!

এর পাশাপাশি নিয়ে আসি শম্বুকের উপাখ্যান। এটিও সবাই জানেন। শম্বুক শূদ্র হয়েও দেবত্বের অভিলাষে তপস্যা করেছিল। সেই কারণেই নাকি এক ব্রাহ্মণ বালকের অকালমৃত্যু হয়েছিল। সেই 'অপরাধে' রাম তার শিরশ্ছেদ করেন। এই পবিত্র কর্মের ফলে শূদ্রতপস্বী আর স্বর্গে যেতে পারল না, তাই দেবতারা প্রসন্ন হয়ে রামের উপর পুষ্পবৃষ্টি করলেন এবং তাঁদের বরে মৃত ব্রাহ্মণ বালক আবার বেঁচে উঠল (উত্তরাকাণ্ড, ৭৫,৭৬)। তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি আর একটি উপাখ্যান। শবরী বলাই বাহুল্য, একটি শবর রমণী। তিনি সিদ্ধা তপস্বিনী। রামের দেখা পাবার জন্য তিনি তপস্যা করছিলেন। রামের দর্শন পেয়ে তিনি সানন্দে দেহত্যাগ করেন এবং সশরীরে স্বর্গে চলে যান। এক ক্ষেত্রে শূদ্র তপস্যা করেও রামের হাতে নিহত হল, এবং রামের হাতে মৃত্যু হলেও স্বর্গে যেতে পারল না. অপর ক্ষেত্রে শবরী তপস্যা করে সিদ্ধা তপস্বিনী হতে পারল এবং স্বর্গলাভ করল। এ কি একজন শূদ্র ও অপরজন শবর বলে? না কি দুটি অংশের সংযোজনের কালের মধ্যে অনেক পার্থক্য ঘটে গেছে বলে এই বৈষম্য? ধীরে ধীরে বৈষম্য বেড়েই চলেছে—যারা নিজেদের 'আর্য' বলে, উচ্চ বর্ণ বলে অন্য সবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তারাই সমাজের শীর্ষস্থানে। আর যারা নিজেদের দেশে আদিবাসী, তারা অবহেলিত, কায়িক পরিশ্রম করে জঠর পূর্তি করা এবং পরের সেবা করা ছাড়া তাদের আর কোনো পন্থা সমাজপতিরা নির্দেশ করেননি।

গ্রন্থপঞ্জি:

মূল গ্রন্থ:

অথর্ববেদ সংহিতা—সম্পাদনা: বিশ্ববন্ধু, হোশিয়ারপুর, ১৯৬০-৬৪

অমরকোশ—সম্পাদনা: হরগোবিন্দ শাস্ত্রী, চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৬৮

উপনিষৎ নবক—সম্পাদনা: অতুলচন্দ্র সেন, কলকাতা

ঋগ্বেদ সংহিতা—সম্পাদনা: ভি. এস. সাতবলেকর, স্বাধ্যায়মণ্ডল, পারডী

মনুসংহিতা—সম্পাদনা: মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, সদেশ, কলকাতা, ২০০৪

মহাভারত—প্রকাশক: গীতা প্রেস

রামায়ণ—প্রকাশক: গীতা প্রেস

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ:

করুণাসিন্ধু দাস—সংস্কৃত সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯

শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়—বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৩

সুকুমারী ভট্টাচার্য—প্রবন্ধ সংগ্রহ (১—৪ খণ্ড), গাঙচিল, ২০১২

শেষ নাহি যার । ছবি : রাজেশ রক্ষিত